সর্বণাশা ভালোবাসা

যুথিকা বড়ুয়া

মানুষ ভালোবাসার কাঙ্গাল। বাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান নারী-পুরুষ প্রতিটি মানুষই একান্ত করে পেতে চায়। সেই সঙ্গে পূর্ণ মান-মর্যাদায় অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দময় জীবন পৃথিবীতে কে না চায়! আর তার জন্য আমাদের কত সাধনা, কত আরাধনা, কত বলিদান, যার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার পরেও সবার ভাগ্যে তা জোটেনা। বিশেষ করে যারা বলির পাঁঠার মতো নিজেকে বাজী রেখে দৈনন্দিন জীবনের সংঘর্ষে চরম ব্যর্থতায় নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত্যে লাঞ্ছিত, প্রবঞ্চিত, প্রতারিত ও নিপীড়িত হয়ে কর্মহীন অনিশ্চিত জীবনের প্রবল যন্ত্রণায় বেমালুম বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে, তাদের ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা। কলুষীত করছে মনোবৃত্তিকে। যখন লোভ-লালসায় নানান প্রলোভনের হাতছানি উপেক্ষা করতে না পেরে নিজের সততা এবং সত্যকে বিসর্জন দিয়ে মিথ্যার কাছে আত্মবিক্রয়, লোভের কাছে নতিস্বীকার এবং ভোগের কাছে বশ্যতা স্বীকার হয়ে অর্থ-ঐশ্বর্য্য, মান-মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠার পিছনে ক্ষুধার্ত হায়নার মতো হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এমন এক অন্ধগলিতে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে শ্রদ্ধা-ভক্তি, আদর-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা কিছু নেই! নেই জীবনের আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবতা! চারিদিকে শুধু চোখধাঁধানো রূপ-রং-রস আর অমৃতের ভান্ডার! যার অন্ধমোহে মোহিত হয়ে বাস্তব পৃথিবী থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে কতগুলি সহজ সরল নীরিহ মানুষ। ফলে আমাদের সুশীলসমাজ থেকে বিচ্যুত এবং প্রিয়জনের সংস্পর্শ থেকে বিতাড়িত হয়ে বদলে যাচ্ছে ফুলের মতো বহু অসহায় নারীর জীবন।

আসলে সেটা মায়া মরীচিকা ছল, ক্ষণিকের মোহ। চোখের রং মুছে গেলেই চারিদিকে কূয়াশার মতো শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। হাত বাড়ালে কিছু নেই। সব শূন্য। আর এই শুন্যতাবোধটুকুই যখন চৈতন্যোদয় হয়, ভরা পেয়ালার অমৃত মধুর সুরাও তখন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে ওঠে। অর্থহীন মনে হয়। যখন সর্বস্ব নিঃশ্ব হয়ে সর্বহারার শোকে বেদনায় হাহাকার ও তীব্র আর্তনাদ বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছাবার মতো কোনো রাস্তাই আর থাকেনা!

বছরখানিক আগে এক জলসায় গিয়েছিলাম। ঘরোয়া পরিবেশ হলেও চোখধাঁধানো ঝাঁড়বাতির ঝিকিমিকি আলোর কণায় বেশ রোমান্টিক লাগছিল। দেখলাম, তখনও থোকায় থোকায় লাল-নীল-হলদে রং-বেরং এর বেলুন আর সুবর্ণ আলোর মালায় চলছে ডেক্‌রেশনের পর্ব। তার ঠিক ঘন্টাখানিক পরই শুরু হয়, চমকপ্রদ প্রসাধনের বাহার ছড়িয়ে, আতরের গন্ধ উড়িয়ে, হাসির ফোয়ারা তুলে বাহুবেষ্টিত যুগলবন্দী কপোত-কপোতীর পালা করে আগমন। কথোপকথনের গুঞ্জরণ। বেশ আনন্দোৎচ্ছলসমারোহে ছেয়ে গিয়ে সৃষ্টি হলো, এক মনোরম রোমাঞ্চকর পরিবেশ। ক্ষীণ শব্দে গ্রামোফোন রেকর্ডে বাজজে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছণা। আগন্তুক অথিতিরাও উন্মত্ত চিত্তে কুশল বিনিময়ে মর্শগুল হয়ে পড়েছে। পাশেই বিরাটাকারের একটা বিস্তৃত টেবিল জুড়ে সাজানো, রকমারি আহার-আয়েশের চমৎকার বন্দোবস্ত! তার সাথে হুইস্কি, বিয়ার, ব্রান্ডি এবং সফ্‌ট ড্রিংক্সও!

হঠাৎ দেখি, ধুমকেতুর মতো এক উর্বশী যুবতী রমণী আর্বিভূত হয়েই তার ডাগরচোখের অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে কাকে যেন খুঁজজে। তার চেহারা আর চটকদারী বেশভূষায় মনে হলো, কোনো এক স্বপ্নপরী, স্প্যানিশ কন্যা! তার পরই দেখি, চোখেমুখের বিচিত্র ইশারায় কি একটা সংকেত প্রেরণ করতে করতে গ্লাসে বিয়ার ঢালছে। ঢেলেই ফিল্মি হিরোহীনদের মতো রহস্যাবৃত চোখের চাউনি মেলে, প্রাণবন্ত চঞ্চলতায় তার

অনাবৃত দুধসাদা মসৃণ নিতম্বখানি দুলিয়ে, ইউরোপীয় ষ্টাইলে প্রসন্ন মেজাজে ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিয়ে পান করতে লাগল। ওর গা-ঘেষে দাঁড়ানো মাথায় পাগড়ী পড়া লম্বাটে সুঠাম সুদর্শণ চেহারার এক তরুণ যুবককেও দেখা গিয়েছিল। সেও দেখি, উচ্ছাসে একেবারে উতল! 555 সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেই পুরুষালী ইমেজে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি মেলে আস্বাদন করছিল, হৃদয়াকর্ষক সৌন্দর্য্যের পারিজাত ঐ উর্বশী রমণীর বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল যৌবনের চমকপ্রদ রূপ, রং আর রস। কিন্তু মন্ত্রের মতো হঠাৎ চোখের পলকে ওরা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আর দর্শণ পাওয়া যায়নি সেই রাতে!

তার মাস ছয়েক পরের ঘটনা। একদিন দৌড়ে যাচ্ছিলাম বাস ধরবো বলে। ইতিমধ্যে ট্রাফিক সিগ্‌নালটা গ্রীণ লাইট পড়তেই বাসটি পাস করে গেল। আর তক্ষুণি মহিলা কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হতেই আমি থমকে দাঁড়াই। -'আও ব্যাহেন আও, ইধার আও!'

পিছন ফিরে দেখি, নির্জীব প্রাণীর মতো একজন অচেনা মহিলা বিমূঢ়-ম্লান মুখে বাসষ্টপীজের ছোট্ট শ্যাল্টারে একা বসে আছে। আশে-পাশে কেউ নেই। চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আবছা অন্ধকার। বৃষ্টিও পড়ছিল গুরি গুরি!

চোখে চোখ পড়তেই ঠোঁটের কোণে বিষন্ন হাসি ফুটিয়ে মহিলাটি বলল,-'হায়, হাউ আর ইউ? পহেচানা? ম্যায় সুলোচনা! এয়াদ হ্যায়?'

চোখ পাকিয়ে দেখলাম, সেই উর্বশী রমণী। জরা জীর্ণের মতো নিথর, নিস্তেজ শরীর। চোখমুখ শুকিয়ে একেবারে গর্তে ঢুকে গিয়েছে। কঙ্কালের মতো শরীরের হাঁড়গুলি বেরিয়ে এসেছে। সাজ-সজ্জার বালাই নেই। কেশ বিন্যাশ এলোমেলো। প্রসাধনের অবস্থাও তদ্রুপ। দামী হলেও মলিনতার ছাপ ছিল প্রকট।

বিস্মিত হয়ে বললাম, -'এ কি, তুমি এখানে? তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছেনা! চেহারার এ অবস্থা কেন তোমার? থাকো কোথায় তুমি?'

ইত্যবসরে নাকের ডগা দিয়ে তীব্রবেগে পাস হয়ে গেল আরো দু'খানা বাস। অথচ বাড়ি ফেরার কোনো তাগিদবোধই করলো না সুলোচনা! মনে হচ্ছিল, প্রবল ঝড়ের মুখে উড়ে আসা মুমূর্ষ্য পাখীর মতো নির্জনে চুপটি করে বসে আছে। সংসারে ওর কেউ নেই! বাড়ি না ফিরলেও ওর খোঁজই করবে না কেউ!

হ্যাঁ, ঠিক তাই! অনুমান মিথ্যে নয়! ওর সন্নিকটে এগিয়ে যেতেই আমায় জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল সুলোচনা। তারপর একটু একটু করে সাশ্রুনয়নে উন্মোচন হতে লাগল, ওর প্রবঞ্চিত জীবনের করুন কাহিনী!

আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে নব পরিণীতা সুলোচনা, এ্যামিগ্রান্ট হয়ে কানাডায় পারি দিয়েছিল, ওর স্বামী সন্দীপের হাত ধরে। সুলোচনা জাতিতে মারাঠী। কলকাতায় একই কলেজে পড়তো দুজনে। শহরের উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবাবের জ্যেষ্ঠপুত্র সন্দীপ। ইকোনমিক্সে মাষ্টার্স করে মাতা-পিতার অসম্মতে সুলোচনার সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ সম্পন্ন করেই পারি জমায় কানাডার ভ্যাঙ্কুবার শহরে। তখন কচি বয়স সুলোচনার। আবেগে, উচ্ছাসে একেবারে উতলা। আকস্মিক নিজস্ব গন্ডী ছেড়ে বাইরের রঙ্গিন পৃথিবীতে পর্দাপণ করে ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, আকাশের চাঁদটাই বুঝি পেয়ে গিয়েছে হাতে।

ওর আর নাগাল পায় কে! খুশীর পাল তুলে মুক্ত-বিহঙ্গের মতো জীবন জোয়ারে একাই ভাসতে লাগল। বিদেশী পর্যটকদের মতো প্রচন্ড বিস্ময় নিয়ে শহরের নানাবিধ মনোহরণকারী দর্শণীয় স্থানগুলি একে একে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। যখন রামধনুর মতো ওর হৃদয়াকাশে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল চিরঞ্জিত সিং।

ততদিনে স্বামী সন্দীপের কাঙ্খিত বাসনাগুলিও একে একে সব পূরণ হতে লাগল। মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চপদস্থ চাকুরী, দেশীয় ষ্টাইলে আলিশান বাড়ি, এ্যাম্বাসেডর গাড়ি, বিলাসবহুল আসবাবপত্র, অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য্য, দামী শাড়ি-গহনা, সব পরিপূর্ণ! যখন স্বর্গসুখ ছিল সুলোচনার হাতের মুঠোয়।

ইতিমধ্যে সন্দীপের আশাতীত চরম সাফল্যের শুভ সংবাদে মনের ক্ষোভ, মান-অভিমান সব অপসারিত করে মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই চলে আসে কানাডায়। যা কখনো ভাবেনি কোনদিন!

কিন্তু বিধিই বাম। মঞ্জুর হলো না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একদিন হঠাৎ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় সন্দীপের অপমৃত্যুতে সুলোচনার জীবন নদীর খেয়া বইতে লাগল, অনিশ্চিত মোহনার দিকে। অচীরেই জীবনে ঘনিয়ে আসে অমবস্যার মতো ঘোর অন্ধকার। যা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

সদ্য স্বামী হারানোর শোকে কাতর মুহ্যমান সুলোচনার অমানবিকভাবে শুরু হয়, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন, দুর্ব্যবহার। মিথ্যে কলঙ্ক, অপবাদ। নিষ্ঠুরের মতো প্রতিনিয়ত শুধু বলতো,-'ডাইনি, রাক্ষসী, কুলাঙ্গার! দূর হ এখান থেকে। তোর কোনো অধিকার নেই এ বাড়িতে থাকবার!'

অথচ তারা একবারও ভেবে দেখলো না, অকাল বৈধব্যে তারুণ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে উনত্রিশ বছরের একটি যুবতী মহিলা একা কোথায় যাবে? কিভাবে জীবনযাপন করবে? কোন্ সাহারায় সে বেঁচে থাকবে?

আর তখনি সাহার্য্যার্থ্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে চিরঞ্জিত সিং। যাকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে, বিশ্বাস করে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিল সুলোচনা। অথচ বুদ্ধিরচাতুর্য্যে সুকৌশলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে সুলোচনার অন্ধকার জীবনে আলোর পথ দেখাতে চিরঞ্জিত ওকে নিয়ে এসে টরন্টো শহরে। যদিও অন্তরাত্মা সায় দিচ্ছিল না কিন্তু বিবেকের দংশণে নিজেকে শান্তনা দিয়ে সুলোচনা ভাবল, দিনকাল বদলে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে মানুষের রুচী, ধ্যান-ধারণা। সতীদাহর প্রথাও উচ্ছেদ করে দিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়। তারুণ্যে বৈধব্যের পূণর্বিবাহের রেওয়াজও বহুকাল থেকে প্রচলিত। পাপ-পূণ্যের দোহাই দিয়ে, নিজের সাধ-আহাল্লাদ, কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দেবার চেয়ে জীবনকে নতুন রঙ্গে, নতুন ঢঙ্গে সাজিয়ে তোলার এই সুর্বণ সুযোগ!

কিন্তু মেয়েদের মন বড়ই নাদান। মতলোবি পুরুষমানুষের ভন্ডামী, সহসায় মনের আয়নায় ধরা পড়েনা। উপরন্তু দৃঢ় বিশ্বাসে আবেগের বশীভূত হয়ে, ভালো-মন্দের যাচাই না করেই অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ভালোবাসার গহীন সমুদ্রে। যার কূল নেই, কিনারা নেই, গন্তব্যর ঠিকানা নেই, নেই বাঁচবার কোনও পথ!

সুলোচনা গিয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে। অপরাহ্নে ফিরে এসে দ্যাখে, ঘরের দরজাটা আলতোভাবে খোলা। ভাবল, চিরঞ্জিত এসে গিয়েছে। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ল, -এ কি, ঘর-দুয়ার এলোমেলো কেন? ঘরের জিনিসপত্র সব গেল কোথায়? তবে কি বাইরের কেউ ঢুকে চুরি করে নিয়ে গেল সব?

সুলোচনা এঘর ওঘর সার্চ করে দেখলো, চিরঞ্জিতের জামা-কাপড় কোথাও নেই। ল্যাদারের বড় একটা স্যুটকেশ ছিল, সেটাও নেই। তার মধ্যেই সযত্নে রাখা ছিল, টাকা-পয়সা, সুলোচনার ল্যাডিং পেপার, কানাডিয়ান সীটিজেনশীপ পেপার, পাসপোর্ট সব। কখন যে চিরঞ্জিত এসে সব হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছে, সুলোচনা ঘূণাক্ষরেও টের পেলো না। এমনকী যে বাড়িতে ওরা থাকতো, সেটাও অন্যের মালিকাধিনে চুক্তিবদ্ধ করে গচ্ছিত রেখে যায়। একটা সুঁতো পর্যন্তও ছিলনা সুলোচনার! শুধুমাত্র পড়নের কাপড় আর হাতের বালাদু'টিই ছিল ওর একমাত্র সম্বল।

কিন্তু তারপরও বিরহ-কাতর সুলোচনার নিস্পাপ মন, চিরঞ্জিতের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিল! ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, চিরঞ্জিত ফিরে আসবেই! কিন্তু চাকুরীর ইন্টারভিউ দেবার বাহানা করে সেই যে ঊষার প্রারম্ভে ঘন কূয়াশায় গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে আসেনি চিরঞ্জিত।

অথচ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধান! বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল চিরঞ্জিত। পিছন ফিরে বেশ কিছুক্ষণ সুলোচনার মুখপানে পলকহীন নেত্রে তাকিয়েছিল! তখন ভেবেছিল, হয়তো কোনো প্রয়োজনেই বোধহয়! কিন্তু দৃষ্টিটা অন্যদিনের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম মনে হতেই ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সুলোচনা। কিন্তু কিছু বলার আর সুযোগ দিলো না চিরঞ্জিত। ইতিপূর্বেই মুখ ফিরিয়ে মায়ার মরীচিকার মতো চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল ঘন কূয়াশার মাঝে। তখন কি একবারও ভেবেছিল, ওর জীবন থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে চিরঞ্জিত অদৃশ্য হয়ে গেল!

সুলোচনা আজ পথের ভিক্ষীরি। অনুতাপ আর অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে হতে জীবনে চাওয়া-পাওয়ার সব স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাগুলি জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মরে গিয়েছে ওর বেঁচে থাকার সাধ। শুধু প্রাণটা নিয়েই এতিমের মতো শহরের অখ্যাত কুখ্যাত অলিতে-গলিতে অপদস্থ, প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও নীপিড়ীত হয়ে অস্তগামী সূর্য্যের মতো প্রহর গুনছে, মৃত্যুর অপেক্ষায়।

টরোন্ট

যুথিকা বড়ুয়া : গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।
rani_guddi@hotmail.com